আগওয়া ক্যানিয়ন

বছরখানেকের একটা কন্ট্রাক্ট নিয়ে সু সেন্ট ম্যারি গিয়েছিলাম। টরোন্টো থেকে সাত শ' কিলোমিটার দূরবর্তি এই মধ্যম আকারের শহরটি দু'টি অংশে বিভক্ত। বৃহত্তর অংশটি কানাডায়, ক্ষুদ্রতরটি আমেরিকায়। মাঝখানে জলরাশি। একটি বিকটাকার ব্রিজ দুই তীরের মাঝে বন্ধনের সৃষ্টি করেছে। এখানে একটি লক আছে যা লেক সুপেরিয়র এবং লেক হিরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। উভয় দিকেই ক্ষুদ্রকায় কয়েকটি জাহাজ রয়েছে নৌবিহারের জন্য। কানাডার দিকে রয়েছে আরেকটি চমকপ্রদ আকর্ষণ - আগওয়া ক্যানিয়নে ট্রেন ভ্রমণ। দুর দুরান্ড় থেকে টুরিস্টরা আসে এই ট্যুর নেবার জন্য। সু সেন্ট ম্যারিতে আসা অবধি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, শেষ পর্যন্ড় সেটি পাওয়া গেলো জুন মাসের মাঝামাঝি। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের ট্রেন ভ্রমণের টিকিটের দাম বেশ চড়া হয়ে থাকে। বড়দের ষাট ডলারের মতো, ছোটদের পঁচিশ। জুন মাসে হঠাৎ করেই ট্যুর কর্তৃপক্ষ দুই দিনের জন্য স্থানীয়দের জন্য ভাড়া অর্ধেক করে দিলো। তাতে টিকিট কাউন্টারের সামনে আধা মাইল লম্বা লাইন পড়ে গেলো। অন্য সময় গ্রীষ্ম এবং শরৎ ব্যতিরেকে ট্রেন প্রায় শূণ্যই থাকে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে শারদীয় রঙের বাহার দেখতে শত শত টুরিস্টরা, প্রধানত আমেরিকান, এই ট্রেন ভ্রমণে যায়। তখন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে টিকিটের দাম বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

ট্রেনে চড়তে হয় নদীর তীরবর্তি স্টেশন থেকে। সকাল আটটায় ট্রেন ছাড়বার কথা। খুব ভোরে উঠে তড়িঘড়ি করে প্রস্তুত হয়ে, কিছু খাবার-দাবার বোঁচকায় বেঁধে, সাতটার দিকে স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। অতি সতর্কতা। কোন অবস্থাতেই ট্রেন মিস করতে চাই না। তাছাড়া ভীড় যে হবে বুঝেছিলাম।

তাড়াতাড়ি গেলে গাড়ী পার্ক করতে সুবিধা হবে। আমরা পৌঁছে দেখলাম সমগ্র শহর যেন উপচে পড়েছে সেখানে। মূল্য হ্রাসের গুরত্ব কতখানি বোঝা গেলো। আমাদের সাথে আরেকটি পরিবার যাবে। এই আশি হাজার মানুষ অধ্যুষিত শহরের মাত্র দ্বিতীয় বাংলাদেশী পরিবার। রাজীব ভাই তার স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে প্রায় চার বছর এখানে বসবাস করছেন। স্থানীয় সু কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ইংল্যান্ড থেকে কানাডা এসে চক্রে পড়ে শেষ পর্যন্ত এই দুরবর্তি শহরে একটি ভদ্র কাজ পাওয়ায় চলে এসেছিলেন। আর ফেরা হয়নি। তাদের সাথে আমাদের পরিচিত হবার ঘটনাটি অভিনব। এখানে আসার পর প্রায় চার মাস আমরা কোন দেশী মানুষের সন্ধান পাইনি। রোজার ঈদের আগমনে শিলির হৃদয়ে বিশেষ আবেগের সঞ্চার হলো। সে টেলিফোন গাইড ঘেটে ঘেটে স্বদেশীয় নামের তালিকা খুঁজতে লাগলো। একাকি ঈদ করতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। রাজীব নাম দেখে মনে খটকা লাগলো। সাথে সাথে ফোন করলো। আলাপ করতেই বেরিয়ে পড়লো – তারা যে শুধু দেশীই তাই নয়, রাজীব ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নবীন শিক্ষক হয়ে ঢুকেছিলেন তখন এই অসম্ভব অমনোযোগী ছাত্রটির শিক্ষকতা করেছিলেন বেশ কয়েকটি মাস। তারপরে একটি স্কলারশীপ নিয়ে ইংল্যান্ড চলে যান। লজ্জাষ্কর হলেও সত্য আমার স্মৃতিতে রাজীব ভাইয়ের কোন ছাপ ছিল না। টরোন্টোতে বসবাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বন্ধুকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করে বড়ই অপমানিত হলাম। তারা রাজীব ভাইকে তাদের হাতের উল্টা পিঠের মতো চেনে।

ট্রেন ছাড়ার কথা ছিলো আটটায়। রাজীব ভাইদের দেখা মিললো মিনিট পাঁচেক আগে। অবশ্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে ট্রেনে নতুন বগি সংযোজন করতে হবে সবার স্থান সংকুলানের জন্য। সুতরাং ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরী হবে। রাজীব ভাই তার স্ত্রী নুসরাত এবং কন্যা লতাকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনে এসে হাজির হলেন। রাজীব ভাইয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা তাদের সাথেই

বসবাস করছেন। তারা আসেননি। পরিবারটির সাথে পরিচয় হওয়া অবধি কিঞ্চিৎ অশনির সংকেত পেয়েছি। ভাবী এখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন পছন্দ করেন না। তার টরোন্টো ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছা। রাজীব ভাই এই চাকরি ছেড়ে যেতে আগ্রহী নন। প্রায়শই নানান কারণে তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি চলে, বোঝাই যায়। লতা ষষ্ঠবর্ষীয়া। খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। হঠাৎ হঠাৎ একদিকে ছুট দেয়। তাকে সামলানো দুষ্কর। লতা থাকলে জাকিকে সামলানোও দুষ্কর হয়। সে বয়েসে বছর দুয়েকের ছোট হলেও কোন অংশে কম যায় না। তাদের দুজনার সম্মিলিত শোরগোলে যে কারও বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে।

অনেক টালবাহানার পর, উপস্থিত জনতাকে বক্ষে ধারণ করে আমাদের প্রাচীনদর্শন কিন্তু মজবুত ও সুপ্রশস্ড় ট্রেনটি অবশেষে যখন স্টেশন ছাড়লো তখন সকাল নয়টা। আমরা পাশাপাশি আসনে বসলাম। বড় বড় সিট, উল্টো ঘুরিয়ে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎমুখী করা যায়।

চমৎকার দিন। উজ্জল সূর্য আকাশ-বাতাস আলোকিত করে গগনে উদিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার জ্যোতি আমাদের মতিতে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাৎ ঘটালো। সকালের চড়া রোদ জানালা ভেদ করে মুখের উপরে এসে পড়ছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে আতিশয্য নজরে এলো তা আমাদের সামান্য তিক্তভাবকে মুহূর্তের মধ্যে ধুমায়িত করে দিলো।

আগাওয়া ওজিবওয়ে ইন্ডিয়ানদের দেয়া একটি নাম, এর অর্থ নিভৃত বন্দর। এমন নাম দেবার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই এলাকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। ১৮৯৯ সালে এলগোমা সেন্ট্রাল রেলওয়ে নর্থ সেন্ট্রাল ওন্টারিওর মাইনিং শহরগুলোর সাথে গ্রেট লেকস - এর তীরবর্তি সু সেন্ট ম্যারি ও মিচিপিকোটিন হারবারের সাথে যোগাযোগ তৈরী করে।

৫১৬ কিলোমিটারের এই রেলপথ শেষ হয়ে হার্স্টে। ১৯৯৭ সালে এলগোমা স্টিল কোম্পানী ওয়াওয়াতে অবস্থিত তাদের মাইন বন্ধ করে দেয়ার ঘোষনা দেয়। ১৯৯৮ সালে রেলওয়ের এই বিশেষ অংশটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে একমাত্র ট্যুর ট্রেনই চলে এই পথে।

আগওয়া ক্যানিয়ন ১৮০ কিলোমিটার উত্তরে। ট্রেন সেখানে পৌছাবে প্রায় চার ঘণ্টা পরে, দুপুর একটার দিকে। ঘন্টা দু'য়েকের বিরতি দেয়া হবে ক্যানিয়নের ভেতরে ঘোরাঘুরি করবার জন্য। তিনটার দিকে ফিরতিপথ। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ফিরে আসবো। সকলেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। লতা ও জাকি তাদের স্বভাবজাত ছুটাছুটি ও চিৎকারে বাতাসে কাঁপন তুলে দিয়েছে। তবে ট্রেনে প্রচুর বাচ্চা-কাচ্চা থাকায় তাদের হুটোপুটি বিশেষ চোখে লাগছে না। শিলি তবুও কয়েকবার ধমকে তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করলো। বিশেষ আমল পেলো না। রাজীব ভাই ও নুসরাত ভাবী পাশাপাশি বসে থাকলেও তাদের ব্যাজার মুখ দেখে বোঝা গেলো আজ সকালেও এক পশলা হয়ে গেছে। দু'জনার দৃষ্টি দুই দিকে।

ট্রেন দুলকি চালে চলেছে, সু সেন্ট ম্যারির শহুরে প্রান্ড়র পেছনে ফেলে নির্মল সবুজ বনানীর ভেতর দিয়ে সশব্দ ঝংকার ব্যস্ড় পাখীর দল আর চঞ্চল কাঠবেড়ালিকে চমকিত করে। যত্রতত্র ছড়ানো নীলাভ ফোঁটার মত অজস্র ছোট ছোট লেক আচমকা উঁকি দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে পশ্চাতে। সকালের ঝকমকা সূর্যের রশ্মির সোনালী ঝিলিক ধাঁধিয়ে দিয়ে যায় আমাদের দৃষ্টি। ভুমি এখানে কখন উত্তল কখন অবতল, কোনটিই খুব বেশি নয়। কিন্তু উচ্চতার তারতম্যের সাথে সাথে দৃশ্যের পরিবর্তন হৃদয়কে দুলিয়ে যায়।

ট্রেনের ভেতরের পরিবেশ আনন্দময়, স্বপ্নের আমেজে পূর্ণ। বড়রা শরীর এলিয়ে দুচোখ ভরে উপভোগ করছে বাইরের দৃশ্য। বাচ্চারা তাদের অকারণ ছুটাছুটি আর কলকাকলিতে মুখরিত করে রেখেছে পরিবেশ। আমি স্টিল এবং ভিডিও দুটি ক্যামেরা নিয়েই মহাব্যস্ড় ভঙ্গিতে ক্রমাগত ছবি তুলে চলেছি। ডানে, বামে, সামনে, পেছনে। শিলি বিরক্তি নিয়ে বললো, "এক জিনিষ কতবার তুলবে?" আমি তাকে একটি কুটিল চাহনি দেই। বোকা মেয়ে! দু'টি দৃশ্য কি কখনো এক হতে পারে? ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

যাত্রাপথে মন্ট্রিয়ল রিভারের উপরে একটি বাঁধ অতিক্রম করে যেতে হয়। বাঁধের উপরে অপূর্ব সুন্দর একটি কাঠের ব্রিজ আছে ট্রেন চলাচলের জন্য। এই দৃশ্যটি খুবই বহুল প্রচারিত। সকলে ক্যামেরা হাতে অপেক্ষা করে থাকে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। দূর থেকে স্থানটি নজরে পড়তেই সকলে জানালার কাছে ভিড় করলো। ট্রেনের গতি কমিয়ে দেয়া হলো যাত্রীদেরকে এই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্যটি প্রাণ ভরে উপভোগ করবার সুযোগ দেবার জন্য। ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক! ট্রেন ধীরে ধীরে ব্রীজের পাদপ্রান্তে পৌঁছালো। আমরা তখন বিস্ময়ে অভিভূত স্বপ্নালু দৃষ্টি নিয়ে পিছু ফিরে ফিরে দেখছি অরণ্য আর জলরাশির সঙ্গমে দাঁড়িয়ে থাকা মনোহারী দৃশ্যটা। রাজীব ভাই এবং নুসরাত ভাবীও মুগ্ধ চোখে একবার পরস্পরের দিকে দ্রত দৃকপাত করলো লক্ষ্য করলাম। ভালো লক্ষণ। আমরা যে প্রকৃতির সন্তান তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটি অপূর্ব দৃশ্য প্রিয়জনের সাথে দাঁড়িয়ে দেখার মর্মই আলাদা। আমি পশ্চাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে শিলির পটাপট দু'টি ছবি তুলি। সে কটাক্ষ করে।

"খামাখা ছবি নষ্ট করছো। এখনো অনেক পথ বাকী"। আমি হো হো করে হেসে উঠি অকারণে। হৃদয় হলো পাগল ওগো তোমায় দেখে প্রিয়ে। মনে

মনে গাই। আমার নজরল এবং রবীন্দ্র সংগীত লিখবার বাতিক আছে, গোপনে গোপনে।

প্রায় চারঘণ্টা পরে, অরণ্যের নিস্তব্ধতা এবং সমাহিত পরিবেশকে দলিত মথিত করে, সুদুর দিগন্তে লেক সুপেরিওয়র ও হাইওয়ে সেভেনটিনের অবয়বকে মুহুর্তে আড়াল করে দিয়ে আচমকা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে থাকে আমাদের জান্ড্রব সর্প। ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক। চারদিকে পাহাড় ঘেরা, একাধিক জলপ্রপাতে আবৃত, ছায়া নিবিড় একটি স্রোতস্বিনীর শীতল জলে সিক্ত যে সবুজ, সুশীতল প্রান্তরটি চোখে পড়লো তাতে বাকহারা হয়ে যেতে হয়। কে জানতো এই অরণ্য আর পর্বতের রাশির মাঝখানে এমন রত্ন লুক্কায়িত থাকতে পারে? ট্রেন যখন ধীরে ধীরে থামলো আমরা পড়ি মরি করে কে কার আগে নামবো সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলাম। বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো। এখানে ট্রেন থামবে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য। অনেক কিছু দেখার আছে। সময় নষ্ট করতে কেউ আগ্রহী নয়।

আমি, শিলি ও জাকি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নীচে নামলাম। আমাদের পেছনেই রাজীব ভাই, ভাবী ও লতা। তাদের মুখে হাসি ধরে না। নুসরাত ভাবীর ঘন মেঘে ছেয়ে থাকা মুখে উজ্জল সূর্যের ঝলক। আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি রাজীব ভাইয়ের হাত ধরবার চেষ্টা করলেন। রাজীব ভাই লাজুক মানুষ। হাত ছাড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। লতা ও জাকিকে উন্মাদের মতো নদীর দিকে ধেয়ে যেতে দেখে আমি ছুটলাম তাদের পিছু পিছু। দু'জনারই অসম্ভব জলপ্রীতি আছে এবং বিন্দুমাত্র কান্ডজ্ঞান নেই। তাদেরকে বগলদাবা করে ফিরে দেখলাম ওয়াশর"মের সামনে বিশাল লাইন পড়েছে। ছেলেমেয়েদের আলাদা বাথরমের ব্যবস্থা রয়েছে। সুভেনীরের দোকানপাট আছে। কয়েকটি খাবারের দোকানও

চোখে পড়লো। আমার বাডার (bladder) মহাশয় কর্মে অতিশয় পটু। বাথর ম দেখলেই আমাকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

সকলের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়া হলে ক্যানিয়ন ভ্রমণে বের হলাম আমরা। প্রায় ১ বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্ট হয়েছিলো এই উপত্যকাটি। এখানে তিনটি নানান আকারের জলপ্রপাত এবং একটি আড়াইশ' ফুট উঁচু লুক আউট ট্রেইল আছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য উপত্যকার মধ্যে মাটির রাস্তা তৈরী করা হয়েছে দর্শনীয় প্রতিটি স্থানে যাওয়ার জন্য। চক্রাকার রাস্তা। একদিকে শুর করে অন্য দিক দিয়ে ফেরা যায়। আমরা নদীর পাশ ধরে মেঠো পায়ে চলা পথেই যাত্রা শুর করলাম। রাজীব ভাইরা গেলেন অন্যদিকে। ঘোরাঘুরি শেষ করে ট্রেনে আবার মিলবো।

আমরা যথাক্রমে বিভার ফলস (১৭৫ ফুট), ব্রাইডাল ভেইল ফলস (২২৫ ফুট) এবং ওটার ক্রীক ট্রেইলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত আরেকটি জলপ্রপাত দেখলাম। ব্রাইডাল ভেইল জলপ্রপাতটিই সবচেয়ে সুন্দর। শিলি মুগ্ধ কণ্ঠে বললো, "এখানে আমার একটা ছবি তোলো। জাকি এদিকে আয়, বাবা"। মাতা-পুত্র বেশ পোশাক-আশাক ঠিক করে, ভাব-ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো ছবির জন্য পোজ দিয়ে । আমি ক্যামেরা হাতে তুলেই প্রমাদ গুনলাম। আবেগের বশে চব্বিশটি ছবির সবগুলোই শেষ করে ফেলেছি। পকেট হাতড়ে গলা শুকিয়ে গেলো। দ্বিতীয় রিলটা বাসাতেই রেখে এসেছি। শিলি তীক্ষ কণ্ঠে বললো "ফিল্ম নেই, তাইতো? যখন আমি একটা ছবি তুলতে চাই, তখন তোমার ফিল্ম থাকে না! আমি কিছু চাইলেই তোমার সমস্যা দেখা দেয়। সেবার মন্ট্রিয়ল গিয়ে ..... "

পরবর্তি আধাঘন্টায় ফিরতি পথে বহু বিস্মৃত স্মৃতি মনে পড়ে যেতে বাধ্য হয়। সামান্য একটি ভুল বিকটাকার সমস্যার সৃষ্টি করে। জাকি দু'হাতে কান চেপে ধরে আছে। একটু পরপরই সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইছে, "আম্মু, তুমি আব্বুকে বক্‌ছো, রাইট (right)? আমাকে না।"

আমি তাদেরকে পিছু ফেলে লুকআউট ট্রেইল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। প্রচুর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকার প্রায় খাঁড়া দেয়াল বেয়ে আড়াইশত ফুট উপরে উঠলাম। শিলি এবং জাকি নীচেই দাঁড়িয়ে থাকলো। উপরে উঠে চারদিকের দিগন্তব্যাপি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মোহিত হলাম। হাতে সময় বেশী নেই। ট্রেন ছাড়তে মিনিট বিশেক বাকী। ফিরতি পথও নিতান্ত কম নয়। আমি তরতরিয়ে নীচে নেমে আসি। রাজীব ভাইরা আমাকে দেখে হাসলেন। তারা ঘোরাঘুরি শেষ করে শিলি ও জাকিকে সঙ্গ দেবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। রাজীব ভাই বললেন, "ক্যামেরার ছবি নাই তো আমাকে বল নাই কেন? আমারটাতে অনেক ছবি আছে"।

শিলি বক্রোক্তি করলো, "পাগলের পা ঝাড়া। ট্রেনে ফালতু ছবি তুলে সব শেষ করেছে"।

আপত্তিকর মন্তব্য। আমি গম্ভীর মুখে না শোনার ভান করি। ফিরতি পথে রাজীব ভাইয়ের ক্যামেরায় সবুজ ঘাসে জড়ানো চত্বরে ফটাফট ছবি তুলে ফেলি দল বেঁধে। স্রোতস্বিনীর উপরে একটি কাঁঠের সাঁকো। ক্লিক!

অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সাথে খাবার দাবার এনেছিলেন। তারা নদীর পাশে আয়েশ করে বসে খাচ্ছেন। বোঝাই যায় এটি তাদের প্রথম আসা নয়। আমাদেরও ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছিলো। ট্রেনে উঠেই সবাই খাদ্যভান্ডারে

হামলা দিয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়লো। চারঘন্টার ফিরতি পথ। সকলের দৃষ্টিই জানালার বাইরে। অনেকের হাতেই সচল ক্যামেরা। ট্রেন খুব ধীর গতিতে উপত্যকার ঢালু দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে এলো। ঝট করেই যেন ছায়া-নিবিড় স্বপ্নময় উপত্যকার নাড়ি ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে এলাম আমরা আবার অরণ্যের মাঝে। এবার আস্তে আস্তে সকলে যে যার আসনে জাঁকিয়ে বসে ঘুমের পায়তারা কষতে লাগলো। দেখা হলো, খাওয়া হলো, ঘোরা হলো। এবার ঘরে ফেরার পালা। ক্লান্ত, অভিভূত চোখ ঘুমিয়ে জড়িয়ে আসে।

যাত্রার সমাপ্তি অবশ্য বিশেষ সুখদায়ক হলো না। মাঝপথে আসতে জানা গেলো লাইনে গোলমাল ধরা পড়েছে। ট্রেন চলতে পারবে কিন্তু যেতে হবে অসম্ভব সতর্কতার সাথে। আমরা বাস্তবিক অর্থেই শম্বুক গতিতে এগুতে লাগলাম। বাচ্চারা এক ঘুম দিয়ে উঠে বললো, "বাসায় এসেছি?"

তাদের প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। শিলি অকারণ কাঠিন্য নিয়ে বলে, "কুফার সাথে বেরিয়েছি, এমনতো হবেই"। বড় আঘাত পাই হৃদয়ে। হৃদয় হলো পাগল ওগো তোমায় দেখে প্রিয়ে, কেমন করে আমায় এমন নিঠুর আঘাত দিলে? মনে মনেই গাই। সুরটি নজরল হবে না রবীন্দ্র হবে সেটা নিয়ে এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি।

চার ঘন্টার পথ সাত ঘন্টায় পেরিয়ে সু সেন্ট ম্যারিতে যখন পৌঁছুলাম তখন রাত দশটা। ট্রেনভর্তি ক্লান্ত, অবসন্ন, তিক্ত যাত্রীদের দল অবশ পায়ে নীচে নামলো। একটি অসম্ভব চমৎকার অভিজ্ঞতার ইতি এভাবে হতে পারে ভাবাই যায় না। ট্রেন কর্তৃপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলকে 'রেইনচেক' দিলো। আমরা সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে আরেকবার এই ট্রিপটি নিতে পারবো। মন্দের ভালো।

আমরা অবশ্য শেষ পর্যন্ড় যাই নি। আমাদের একটি বন্ধু পরিবার টরোন্টো থেকে বেড়াতে এসেছিলো। তাদেরকে দিয়েছিলাম। তারা মুগ্ধ হয়েছিলো। আমাদের আনন্দ পরিপূর্ণতা পেয়েছিলো।